বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার প্রতিযোগিতা -২০১২

(প্রথম পর্ব)

আগস্ট -২০১২

ঃ পরিচালনায় ঃ

বিজ্ঞান দরবার

৩৬/৩/বি , গৌড় বাবু রোড, কাঁচরাপাড়া , উত্তর ২৪ পরগণা

-ঃ মূল্যায়ণের বিষয় ঃ-

বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভার বিকাশে মস্তিষ্কর ভূমিকা

মস্তিষ্কে সঞ্চিত সংশ্লিষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে স্মরণে এনে আমরা মস্তিষ্ক থেকে এগুলিকে বাইরে বের করি । তারপর প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজের বিভিন্ন বস্তুগত উপাদানের সাথে এগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে আমরা নতুন কিছু ভাবি, বুঝি বা উদ্ভাবন করি । এরই নাম বুদ্ধি, প্রতিভা বা সৃজনশীলতা । এখানে মস্তিষ্কর ভূমিকা সব মানুষের ক্ষেত্রেই একইরকম । পার্থক্যটা মানুষের উপর পরিবেশ, প্রকৃতি ও সমাজের প্রভাবকে কেন্দ্র ক'রে । কিছু কিছু মিল থাকলেও এই প্রভাব কখনও দুটি মানুষের ক্ষেত্রে একইরকম নয় ।

সাহায্য মাত্র - ২টা

অনিমেষ কোন বছরেই সব বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়ে ক্লাশ উত্‌রোয় নি । বাবা-মা প্রথম প্রথম বকাবকি করত, এখন আর করে না । ওদের মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে যে অনিমেষের মাথাটাই ভাল না । অতএব যা হচ্ছে হোক। অনিমেষ ক্লাশেও ব্যাক বেঞ্চার । প্রথম প্রথম স্যারেরা পড়া জিজ্ঞেস করতেন এবং পড়া না পারলে মারতেন। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা নিয়মিত হয়ে যাওয়াতে স্যারেরা অনিমেষ ও অনিমেষের মতো ছেলেদের পড়া ধরা ছেড়ে দিয়েছেন । অনিমেষের নিজের মধ্যেও এতদিনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ওর মেধা খুবই কম ।

শুধু অনিমেষ, ওর বাবা-মা এবং ওর মাস্টারমশাইরাই নয়, মেধা নিয়ে এরকম ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যেই রয়েছে । ধারণাটা এরকম — মেধা একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য যা নির্ধারিত হয় মস্তিষ্কের দ্বারা । অর্থাৎ মানুষ যে মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায় তার মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতের মেধা । এই মস্তিষ্কর জন্য কেউ আইনস্টাইন হয়, কেউ রবীন্দ্রনাথ হয়, আবার কেউ অনিমেষ হয় । অর্থাৎ বুদ্ধি, সৃজনশীলতা ও প্রতিভা সবকিছু নির্ভর করে মস্তিষ্কর উপর ।

কিন্তু একজন মানুষ যে বুদ্ধিমান বা প্রতিভাবান তা আমরা কখন বুঝি ? বুঝি সেই প্রতিভার পরিচয় পাওয়ার পর । আগে - ভাগে বোঝার উপায় নেই । এর অবশ্য একটি যুক্তিও আছে । মস্তিষ্কটা থাকে খুলির মধ্যে । তাকে তো আর বাইরে থেকে দেখা যায়না । অতএব আগে-ভাগে বোঝার প্রশ্নই নেই । এই যুক্তি কিন্তু এখন আর টেকে না, কারণ মস্তিষ্কর গঠন ও কার্যপ্রণালীর সবটাই প্রায় আমাদের জানা । অতএব মেধাটা মস্তিষ্কর কোথায় থাকে তা আমরা একটু খুঁজে দেখার চেষ্টা করতে পারি ।

জীবজগতে মানব মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় ব্যতিক্রমী কিনা তা দু'ভাবে দেখার সুযোগ আছে। যথা—মস্তিষ্কর পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য ও মস্তিষ্কর গুণগত বৈশিষ্ট্য ।

পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য : মস্তিষ্ক শুধু মানুষেরই আছে এমনটা নয় । বহু প্রজাতির মস্তিষ্ক আছে । মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র । এজন্য একে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রও বলে । যে কোন মেরুদন্ডী প্রজাতির মস্তিষ্ক রয়েছে এবং তা সুগঠিত । এদের মধ্যে আবার পাখী এবং স্তন্যপায়ী শ্রেণীর মেরুদন্ডী প্রজাতির মস্তিষ্ক বেশী সুগঠিত । বিপরীতে অনেক অমেরুদন্ডী প্রজাতির স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রগুলি গুটি কয়েক স্নায়ুতন্তু দ্বারা ঘেরা একটা বৃত্ত মাত্র । সিলেনটরেটা শ্রেণীর অমেরুদন্ডী প্রজাতির স্নায়ুতন্ত্রে কোন কেন্দ্র নেই । শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু স্নায়ুকোষ । প্রোটোজোয়া এবং পরিফেরা শ্রেণীর প্রজাতির শরীরে কোন স্নায়ুতন্ত্রই নেই ।

একসময় ধারণা ছিল মস্তিষ্কর আয়তন তথা ভরের সাথে মেধার একটা সম্পর্ক আছে । ভর বেশি হলে বুদ্ধি বেশি হয়, ভর কম হলে বুদ্ধি কম হয়। শুধু স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রজাতিদের কথাই যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে সবচাইতে ক্ষুদ্র-ভর মস্তিষ্ক রয়েছে বাঁদুরদের –মাত্র ৭৪ মিলিগ্রাম । এক গ্রামেরও অনেক কম । সবচাইতে বেশি-ভর মস্তিষ্ক রয়েছে তিমি মাছের (Spermand Killer Whale) –১০কি.গ্রা। ধারণা অনুযায়ী তিমি মাছের বুদ্ধি সবচাইতে বেশী থাকার কথা কিন্তু বাস্তবে মানুষের

বুদ্ধি সবচাইতে বেশী , অথচ মানুষের মস্তিষ্কর ভর মাত্র দেড় কেজির কাছাকাছি। অতএব মস্তিষ্কর আকার, আয়তন –ভর বেশী হলেই বুদ্ধির বহর তুলনামূলকভাবে বেশি হবে —এর স্বপক্ষে একেবারেই যুক্তি মেলে না ।

একপক্ষ মানুষ এজন্য ধারণাটাকে একটু বদলে নিয়ে বলেন – নিছক ভর নয়, বরং বলতে হবে সমগ্র দেহের ভরের আপেক্ষিকে মস্তিষ্কর ভর যাদের বেশী তাদের বুদ্ধি বেশী এবং যাদের এটা কম তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম । বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এই ধারণাকেও সমর্থন করে না। দেহের ভরের সাথে মস্তিষ্কর ভরের সম্পর্ক বোঝবার জন্য ২০টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি নিয়ে একটা গবেষণা হয়েছিল । ফলাফল ভারী মজার । এদের মধ্যে এক ধরণের ছোটো জাতের ইঁদুরের পরিণত বয়সে গড় দেহ-ভর সব চাইতে কম — মাত্র তিন গ্রাম। সবচাইতে বেশি গড় দেহ-ভর তিমি মাছের –১৫০ মেট্রিক টন । অর্থাৎ এই ২০টি প্রজাতির মধ্যে গড় দেহ -ভরের পার্থক্য ৫ কোটি । বিপরীতে, এদের মধ্যে সবচাইতে মস্তিষ্ক ভর কম বাঁদুরের– মাত্র ৭৪ মিলিগ্রাম এবং সবচাইতে বেশী মস্তিষ্ক -ভর তিমি মাছের - ১০ কেজি । অর্থাৎ মস্তিষ্ক ভরের পার্থক্য ১৩০০০০ গুণ । অতএব দেখা যাচ্ছে প্রজাতির ক্ষেত্রে দেহ-ভরের সাথে মস্তিষ্ক -ভরের সম্পর্ক একইরকম নয় । ইঁদুরের মস্তিষ্ক-ভর দেহ -ভরের ১০ শতাংশ, মানুষের ক্ষেত্রে এটা দুই শতাংশ , শূকরের ক্ষেত্রে এটা ০.১ শতাংশ এবং নীল তিমির ক্ষেত্রে এটা ০.০১ শতাংশ । যদি দেহ-ভরের তুলনায় মস্তিষ্ক -ভর বেশী হলে বুদ্ধি বেশী হয়, তাহলে মানুষের বুদ্ধি শূকর এবং তিমির চাইতে বেশী – এটা ঠিকই আছে। কিন্তু ইঁদুর মানুষের চাইতে বেশী বুদ্ধিমান বনে যাচ্ছে । যদি উল্টোটা ধরা হয় অর্থাৎ দেহ- ভরের তুলনায় মস্তিষ্ক- ভর যত কম হবে বুদ্ধি তত বেশি হবে তাহলে মানুষ ইঁদুরের চাইতে বেশী বুদ্ধিমান হচ্ছে ঠিকই , কিন্তু শূকর এবং তিমি মানুষের চাইতে বেশী বুদ্ধিমান বনে যাচ্ছে ।

এতো গেল অন্যান্য প্রজাতির প্রেক্ষিতে মানুষের অবস্থা । এবার দেখা যাক মানুষের মস্তিষ্কর বিবর্তনের পথটা কেমন । আধুনিক মানুষ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাইমেট বর্গের একটি প্রজাতি যার বর্তমান জৈব নাম হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স । মানুষের নিকট পূর্ববর্তী কিছু প্রজাতির নাম মস্তিষ্কর আয়তন নীচে দেওয়া হল ।

প্রজাতির নাম	সর্বনিম্ন আয়তন	সর্বোচ্চ আয়তন
শিম্পাঞ্জী	২৭৫ ঘন সেমি	৫০০ ঘন সেমি
হোমোইরেকটাস	৮৫০ ঘন সেমি	১২৫০ ঘন সেমি
নিয়ানডার্থাল	১১০০ ঘনসেমি	১৭৫০ ঘন সেমি
হোমো স্যাপিয়েন্স	১০০০ ঘন সেমি	২২০০ ঘন সেমি

উপরের তালিকার দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে যে শুরুতে শিম্পাঞ্জী এবং তার মস্তিষ্কর আয়তন ২৭৫-৫০০ ঘন সেমি । তারপর বিবর্তনের পথে মস্তিষ্কর আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু এই ধারা নিয়ানডার্থালে এসে মুখ থুবরে পড়েছে। মানুষের পূর্ববর্তী প্রজাতি নিয়ানডার্থালের মস্তিষ্কর গড় আয়তন ছিল ১৪৫০ ঘন সেঃমিঃ । বিপরীতে আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের গড় আয়তন ১৩৪৫ ঘন সেমিঃ । অতএব প্রাইমেট বর্গে বিবর্তনের সাথে সাথে মস্তিষ্কর ভর ও আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে

এবং সে কারণেই মানুষ সবচাইতে বুদ্ধিমান প্রজাতি –এটাও বলা সম্ভব নয়।

সারা পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তারা সবাই একই প্রজাতিভুক্ত হলেও অঞ্চলভেদে মস্তিষ্কর আয়তনের তারতম্য আছে।

আঞ্চলিক গ্রুপের নাম	মস্তিষ্কর গড় আয়তন (ঘন সেমিঃ)
অস্ট্রেলিয়ান মূলবাসী	১২৫৬
নিউ গিনি	১২৮০
আফ্রিকান নিগ্রো	১৩৪৬
পশ্চিম এস্কিমো	১৪৭৩
ইংরেজ	১৪৮০
মেরিয়ান	১৪৯০
মোঙ্গল	১৫৭৩

তালিকার দিকে চোখ রাখলেই দেখা যাবে মোঙ্গলদের চাইতে ইংরেজদের মস্তিষ্কর গড় আয়তন ৯৩ ঘন সে.মি. কম। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতিতে মোঙ্গলদের ভূমিকা ইংরেজদের ভূমিকার সাথে কোনরকম তুলনাতেই আসে না।

নারী -পুরুষ ভেদেও মস্তিষ্কর আয়তন বেশ বিচিত্র রকমের। নারীদের মস্তিষ্কর গড় আয়তন পুরুষদের গড় আয়তনের দশ শতাংশ কম। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-গবেষণা, খেলাধূলা, প্রশাসন, শিল্প প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই দশ শতাংশ হারে বা অন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়মে নারী পুরুষদের চাইতে পিছিয়ে নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রেই নারীর মানসিক ক্ষমতা পুরুষদের চাইতে বেশী।

অতএব মস্তিষ্কর আয়তন, ভর, আকার প্রভৃতি কোন কিছুর সাথে বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা, ইত্যাদির কোন সম্পর্ক দাঁড় করানো যাচ্ছে না।

মস্তিষ্কর গুণগত বৈশিষ্ট ঃ মস্তিষ্কর গুণগত বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে এবং সেই কাজ কীভাবে জীবের প্রয়োজন মেটায়। এটা ভালভাবে বোঝাবার জন্য স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কর গঠন সম্পর্কে সামান্য ধারণা পেতে হবে।

মস্তিষ্ক সহ সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের এককের নাম নিউরন। নিউরন আসলে একধরণের দেহকোষ। কিন্তু এর গঠনটা একটু আলাদা এবং এর কাজটা একটু বিশেষ ধরণের হওয়ার জন্য এর নাম হয়েছে নিউরন। নিউরনের কোষ প্রাচীর থেকে সরু সুতোর মত অসংখ্য তন্তু বেরিয়ে গেছে। এদের মধ্যে একটি তন্তু খুবই বড়। একে অ্যাক্সন বলে। বাকীগুলিকে ডেনড্রন বলে। একটি নিউরনের অ্যাক্সন অপর আর একটি নিউরনের ডেনড্রনে যুক্ত থাকে। একেবারে যুক্ত থাকে বলা যাবে না। অ্যাক্সন এবং ডেনড্রনের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র পরিসরের একটা ফাঁক থাকে। একে সাইনাপস বলে। যাইহোক, এভাবে নিউরন পরপর যুক্ত হয়ে লম্বা স্নায়ুতন্তু তৈরী করে। অসংখ্য স্নায়ুতন্তু আমাদের শরীরে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে শরীরের উপর এমন একটা বিন্দু পাওয়া যাবে না যেখানে সূঁচ ফোটালে সুঁচের আগা কোন না কোন স্নায়ুতন্তুতে গিয়ে বিঁধবে না। মস্তিষ্কে নিউরনগুলি পরপর যুক্ত হয়ে পিন্ড আকারে থাকে।

স্নায়ুতন্ত্রে আর এক ধরণের কোষ থাকে । এদের গ্লিয়াল কোষ বলে । গ্লিয়ালকোষ এক ধরণের প্রোটিন তৈরী করে যা নিউরনের অ্যাক্সন ও ডেনড্রনের উপর জমা হয়ে শক্ত আবরণ তৈরী করে, যার ফলে তন্তুগুলি বেশ শক্ত হয় । এই আবরণকে মায়েলিন সীদ বলে । স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত একক যেমন নিউরন, তেমনি স্নায়ুতন্ত্রের কাজের একক বলতেও বোঝায় নিউরনের কাজকে । সমস্ত নিউরনের কাজের যোগফলই হল স্নায়ুতন্ত্রের কাজ । অতএব একটি নিউরন কী কাজ করে তা বুঝতে হবে ।

আমরা আগেই বলেছি নিউরন এক ধরণের দেহকোষ । অতএব কোন প্রজাতির দেহকোষে যে সংখ্যক ক্রোমোজোম এবং ক্রোমোজোমগুলিতে যে সংখ্যক জিন বা ডি এন এ থাকে সেই প্রজাতির নিউরনেও একই সংখ্যক ক্রোমোজোম ও জিন থাকে । জিনের কাজ প্রোটিন তৈরা করা । নিউরনেও এর ব্যতিক্রম নেই । দেহের কোন নির্দিষ্ট অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের যে কোন কোষে অসংখ্য জিন থাকলেও নির্দিষ্ট কিছু জিন সক্রিয় অর্থাৎ প্রোটিন তৈরী করে । এই জিনগুলি আবার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিষ্ক্রিয় । একইভাবে নিউরনেও কিছু নির্দিষ্ট জিন সক্রিয় এবং প্রোটিন তৈরী করে । এদেরকে নিউরোপ্রোটিন বলে । নিউরনের কাজ সংকেত বা বার্তা আদান-প্রদান। একটি নিউরনের অ্যাক্সন সেই নিউরন থেকে বার্তা বহন করে তা পৌঁছে দেয় সাইনাপসে এবং পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রন সাইনাপস থেকে বার্তা গ্রহণ করে আবার তার অ্যাক্সনের মাধ্যমে সেই বার্তা পরবর্তী সাইনাপসে পৌঁছে দেয় । এভাবেই শরীরের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে প্রয়োজনে বার্তা বা সংকেত পরিবাহিত হয় । এই বার্তা বা সংকেতকে আমরা তড়িৎ-রাসায়নিক বার্তা বলি কারণ এই প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পদার্থ ও তড়িৎ উভয়েরই প্রয়োজন হয় । রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে কাজ করে নিউরোপ্রোটিন এবং কিছু কিছু ক্ষুদ্র অণু যা নিউরনের সাইটোপ্লাজমে উৎসেচক সংশ্লেষের সময় তৈরী হয় । নিউরোপ্রোটিন ও এইসব ক্ষুদ্র অণুদের একত্র নিউরোট্রান্সমিটার বলে । তড়িৎশক্তি তৈরীর কাজটা করে Na^+ ও K^+ । নিউরনের এই কার্যপদ্ধতি যে কোন প্রজাতির জীবদেহে একইরকম । কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নেই ।

স্নায়ুতন্ত্র যে কাজটা করে তার একটা উদ্দেশ্য আছে । এই উদ্দেশ্যটা হল জীবজন্তুর সাথে তার চারপাশের পরিবেশের সম্পর্ক তৈরী করা । অর্থাৎ ভৌত সমন্বয় সাধন । যে কোন প্রজাতির এককজীব প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই সমস্যাগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা –খাদ্য ও পুষ্টি , প্রজনন এবং আত্মরক্ষা। এজন্যই ভৌত সমন্বয়ের প্রয়োজন । দেখা , শোনা , চাপ ও তাপের অনুভব , ব্যথার অনুভব, কোন কিছু নির্বাচন করা , ঘ্রাণ গ্রহণ , প্রতিকূল অবস্থাকে বোঝা —এরকম অসংখ্য কাজের মধ্য দিয়ে ভৌত সমন্বয়ের কাজটা হয় ।

স্নায়ুতন্ত্র ভৌত-সমন্বয়ের জন্য মস্তিষ্ককে তিনটি দায়িত্ব দিয়েছে । যথা অভিজ্ঞতা গ্রহণ , অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার স্মরণ বা উদ্‌গীরণ । যে কোন কাজের ফসল মানেই অভিজ্ঞতা । ধরা যাক –একটা ফুল যা আগে কোনদিন দেখিনি। ফুলটির রং , রূপ, গন্ধ, আকার , যদি নাম জানা যায় তাহলে নাম –প্রভৃতি প্রত্যেকটাই এক একটি অভিজ্ঞতা । ফুলটিকে দেখা মানে রং, রূপ ও আকার -এই তিনটি দর্শন

–অভিজ্ঞতা গ্রহণ। তেমনি গন্ধ গ্রহণ ও নাম জানা যথাক্রমে ঘ্রান অভিজ্ঞতা ও শ্রবণ অভিজ্ঞতা। এর পরে আবার যদি কখনও অন্য কোথাও এই ফুলটিকে দেখতে পাওয়া যায় বা ফুলটির ছবি দেখা যায় বা ফুলটির নাম শোনা যায় বা একই রকম গন্ধ নাকে পাওয়া যায় তাহলে সব অভিজ্ঞতাগুলি স্মৃতিতে ভাসবে, অর্থাৎ অভিজ্ঞতাগুলি মস্তিষ্কে জমা ছিল এবং তার উদ্‌গীরণ হল। এই তিনটি কাজ ছাড়া মস্তিষ্ক আর কোন কাজই করতে পারে না এবং এই কাজগুলির সাথে বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। ভৌত সমন্বয়ের এই প্রক্রিয়া ও তার জন্য মস্তিষ্কর দায়িত্ব মানুষের যেমন, অন্যান্য প্রাণীদেরও তেমন। পার্থক্যটা অভিযোজনে। মানুষ ছাড়া অন্য যে কোন প্রজাতি তার বিবর্তনের সময় যে অভিযোজনগুলি তৈরী করে সেইসব অভিযোজনকে একইভাবে অনুশীলন করে প্রজাতিটি সুদীর্ঘকাল পৃথিবীর উপর টিকে থাকে। একমাত্র মানুষের অভিযোজনগুলিই পরিবর্তনশীল। যেমন একসময় মানুষ ছিল গুহাবাসী। এর পরের ধাপ লতা-পাতা ও ডাল-পালা দিয়ে তৈরী আচ্ছাদন, তারপর ক্রমান্বয়ে মাটির বাড়ি, কাঁচা ইটের বাড়ি, পোড়া ইটের বাড়ি ইত্যাদি। এখন বহুতল অট্টালিকা। এজন্যই মনে হয়, মানুষ বোধহয় বেশি বুদ্ধিমান এবং মানুষের মধ্যে আবার কেউ কেউ আরও বেশী বুদ্ধিমান যারা নতুন কিছু উদ্ভাবন করে। অন্যান্য প্রজাতিদের অভিযোজন যেমন জৈব বিবর্তনের সাথে তৈরী হয়েছিল, তেমনি মানুষের পরিবর্তনশীল অভিযোজনের কারণও জৈব বিবর্তন, কিন্তু তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর সাথে মস্তিষ্কর কোন আলাদা সম্পর্ক নেই।

পরিবর্তনশীল অভিযোজনের কারণে মানুষের সমাজে তৈরী হয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা যা অন্য কোন প্রজাতির নেই। শুরু থেকে যত সময় এগিয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থার তত বিকাশ ঘটেছে। মানুষের সমাজে অভিযোজন অনুশীলনের পদ্ধতি একরকম নয়। কারো লাঙ্গল চাষে চলে, কারো কলম পিষে, কেউ কাঠের জিনিসপত্র বানায়, কেউ মাটির জিনিসপত্র বানায় অথবা কেউ শিক্ষকতা করে, কেউ চিকিৎসা করে ইত্যাদি হরেক রকমের পেশা। জীববিদ্যার ভাষায় এগুলি সবই অভিযোজন অনুশীলন। এজন্যই একজন মানুষ পরিবেশগতভাবে আর একজন মানুষ থেকে পৃথক। একইভাবে বিভিন্ন মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন। স্বাভাবিক কারণেই মানুষের মধ্যে ভৌত সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। দুজন মানুষের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও একশ শতাংশ কখনও একরকম নয়। অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে অভিযোজন একই রকম হওয়ার জন্য এবং কোনরকম বিকল্প না থাকার জন্য প্রতিটি জীবকেই তা বাধ্য হয়ে অনুসরণ করতে হয় এবং সে খুব সহজেই তা অনুশীলন করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এজন্য অন্যান্য প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে মিল প্রায় ১০০ শতাংশ। মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনীয়তার **(variation)** কারণে যে কোন অভিযোজনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন যুগপৎ অনুশীলন **(learning)** ও প্রশিক্ষণ **(Teaching)**। শুধু প্রশিক্ষণ, কিন্তু অনুশীলনের কোন চেষ্টা নেই ; অথবা অনুশীলনের চেষ্টা প্রবল, কিন্তু প্রশিক্ষণে খামতি –এরকম হলে অভিযোজনে অভ্যস্ত হওয়া যাবে না। প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন –দুটোই সমানভাবে প্রয়োজন। অনিমেষদের সমস্যা এখানে। সমস্যা ভৌত সমন্বয়ের পদ্ধতিতে। মস্তিষ্কে নয়।